প্রথম আলো
বুধবার ১৭ জানুয়ারী ২০২৪

জাতীয় সংসদ নির্বাচন

এবারের নির্বাচন রাজনীতিতে অনেক প্রশ্ন রেখে যাবে

এম সাখাওয়াত হোসেন

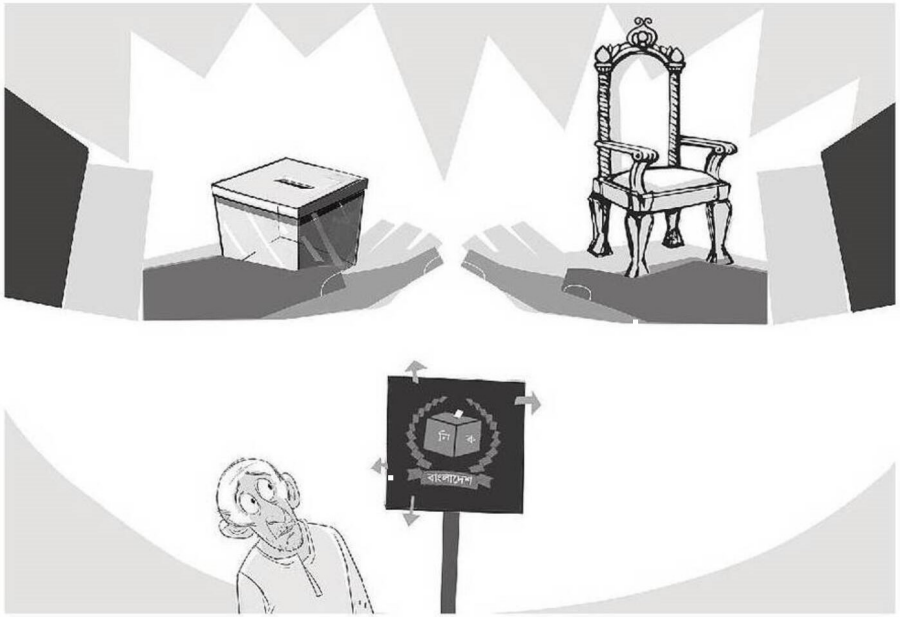

বহু নাটকীয়তা আর তর্কবিতর্ক এবং শক্তিধর বিদেশি রাষ্ট্রগুলোর হুমকি-ধমকির মধ্যেও দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন হয়ে গেল। যত বাধাবিপত্তি থাকুক না কেন, অতীত পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, কোনো দল ক্ষমতায় থাকলে এবং তারা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হলে নির্বাচন প্রতিহত করা সম্ভব হয় না। ১৯৯৬ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারির নির্বাচন ঠেকানো যায়নি আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে অন্যান্য বড় দলের বিরোধিতা সত্ত্বেও। মাত্র ২১ শতাংশ ভোটার ভোট দিয়েছিলেন। এরপর ২০১৪ সালেও বৃহৎ বিরোধী দলগুলো বিরোধিতা করলেও নির্বাচন ঠেকানো যায়নি।

৭ জানুয়ারির নির্বাচন ঠেকাতেও দেশের বড়-ছোট অনেক দল মিলে চার বছর ধরে ধারাবাহিক আন্দোলন করেছে, কিন্তু সফল হয়নি। বরং বড় বিরোধী দল বিএনপির হাজার হাজার নেতা-কর্মী এখন জেলে ও অসংখ্য নেতা-কর্মী পালিয়ে রয়েছেন। সরকার ও তাদের সহযোগীরা বলা যায় নির্বিঘ্নে নির্বাচন করে ফেলেছে। বিশ্বের তিনটি বড় শক্তি এই সরকারের ২০১৪ ও ২০১৮ সালের নির্বাচন দুটিকে স্বীকৃতি দিতে কোনো দ্বিধা করেনি। অনেক সমস্যাসংকুল নির্বাচন হলেও এবারও তারা আগের ধারা বজায় রেখেছে।

২০১৪ সালের নির্বাচনকে ভোটারবিহীন বলা হয়, কারণ তখন ৩০০ আসনের মধ্যে ১৫৩টি আসনের প্রার্থীরা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হয়েছেন। দেশি-বিদেশি বিশ্লেষকেরা এই নির্বাচনকে ব্যর্থ আখ্যায়িত করলেও সরকার পূর্ণ মেয়াদে দেশ পরিচালনা করেছিল। বিরোধীরা সহিংস আন্দোলনের মাধ্যমে প্রতিহত করার চেষ্টা করেও সফল হয়নি। আবার ২০১৮ সালের নির্বাচন যে সুষ্ঠু হয়নি, তা নিয়ে খুব বিতর্ক নেই। রাত-দিন মিলিয়ে যে নির্বাচন হয়েছে, তা এখন সরকারি দলের শীর্ষ নেতাদের থেকে তৃণমূল পর্যায়ের নেতাদের মুখেও শোনা যায়। আর প্রধান বিরোধী দল ও সমমনা দলগুলোর বর্জনের কারণে এবারের নির্বাচনে ভিন্ন কৌশল লক্ষ করা গেছে। এবারের নির্বাচনের ধরন আগের দুটির ধারেকাছেও নেই।

নির্বাচনকালীন সরকারের দাবিতে এবার ২৬টির মতো নিবন্ধিত ও প্রায় সমানসংখ্যক অনিবন্ধিত নতুন কিন্তু পরিচিত হয়ে ওঠা দল সংঘবদ্ধ হয়েছিল। কিন্তু এবার ২০১৪ সালের মতো কোনো পরিস্থিতি তৈরি হয়নি, বরং নির্বিঘ্নেই নির্বাচনটি হয়েছে। বিরোধী দলগুলোকে এ ক্ষেত্রে ন্যূনতম ছাড় দেওয়া হয়নি।

তবে এবারের নির্বাচন, নির্বাচন-পরবর্তী পরিবেশ এবং যে মডেলে এবার নির্বাচনটি হলো, তার সুদূরপ্রসারী প্রভাবের কিছু বিষয় আলোচনার দাবি রাখে। প্রথমত, কাগজে-কলমে ২৬টি নিবন্ধিত দল এই নির্বাচনে অংশ নিলেও এটা হয়েছে কার্যত একদলীয় নির্বাচন। ক্ষমতাসীন দল আওয়ামী লীগের বাইরে উল্লেখ করার মতো দলটি ছিল জাতীয় পার্টি। যদিও জাতীয় পার্টি এখন প্রায় বিলুপ্তির পথে। আর ছোট তিনটি দলের মধ্যে সাম্যবাদী দল, বহু বছর ধরেই মাঠে নেই। ওয়ার্কার্স পার্টি আওয়ামী লীগের ছত্রছায়ায় এত দিন যেভাবে ছিল, এবারের নির্বাচনে সেই অবস্থানের আরও অবনতি হয়েছে। আর জাসদ এখন অস্তিত্বের সংকটে পড়েছে সরকারি দলের প্রতীক নিয়েও দলটির প্রধান সাবেক তথ্যমন্ত্রী হাসানুল হক ইনুর পরাজয়ের পর। তবে ১৫ বছর বিরোধী জোটের রাজনীতিতে বিশ্বাসী কল্যাণ পার্টির প্রধানের উপস্থিতি একমাত্র ব্যতিক্রম।

বহুদলীয় ব্যবস্থার মধ্যে এই নির্বাচনকে একদলীয় বলতে হচ্ছে, কারণ সাক্ষী গোপালের মতো যে দলগুলো এই নির্বাচনে অংশ নিয়েছে, তারা প্রদত্ত ভোটের ১ শতাংশ পেয়েছে কি না সন্দেহ রয়েছে। তবে ২০১৮ নির্বাচনেও এরূপ চিত্র পাওয়া যায়। সেই নির্বাচন অন্তর্ভুক্তিমূলক ছিল এবং সেখানে ৩৯টি দল অংশগ্রহণ করলেও তিনটি দল ৫ শতাংশের ওপরে, দুটি ২ শতাংশের নিচে এবং বাকি দলগুলো ১ শতাংশের নিচে ভোট পেয়েছিল। সেসব দলকে জনগণ মনে রেখেছে কি না, সন্দেহ রয়েছে।

২০২৪ সালের নির্বাচনের পদ্ধতি ভিন্নতর হলেও দলীয় হিসাব প্রায় একই রকম। এবার সরকারি দল নির্বাচনকে অংশগ্রহণমূলক ও প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক দেখাতে দলের নির্ধারিত প্রার্থীর বাইরে দলের বিধিনিষেধ শিথিল করে অংশগ্রহণ উন্মুক্ত করে স্বতন্ত্র এবং কথিত 'ডামি' প্রার্থীদের নির্বাচনে অংশ নেওয়ার সুযোগ করে দেয়। সঙ্গে সামান্য পরিচিত ও কথিত অপরিচিত ২৬টি দল (আওয়ামী লীগ ও জাতীয় পার্টি বাদে)। মোট প্রার্থী ছিল ১ হাজার ৯৬৯। এর মধ্যে ১ হাজার ৪৪১ প্রার্থীর জামানত বাজেয়াপ্ত হয়েছে, যা সম্ভবত একটি রেকর্ড। মানে ৭৩ শতাংশ প্রার্থীর জামানত বাজেয়াপ্ত হয়েছে। প্রাপ্ত পরিসংখ্যান অনুযায়ী ২৮টি দলের মধ্যে ২১টি দলের সব প্রার্থীই জামানত হারিয়েছেন। এটি এ পর্যন্ত বাংলাদেশের নির্বাচনের ইতিহাসে রেকর্ড।

প্রাপ্ত ফলাফল অনুযায়ী, ৩০০ আসনের মধ্যে ২২৩টি আসন পেয়েছেন আওয়ামী লীগের দলীয় প্রার্থীরা। ১৪ দলের সমন্বয়ে গঠিত সরকারদলীয় জোটের দুই দল ওয়ার্কার্স পার্টি ও জাসদ পেয়েছে ১টি করে আসন। আওয়ামী লীগেরই কথিত স্বতন্ত্র এবং ডামি প্রার্থীরা বিজয়ী হয়েছেন ৬২ আসনে। সরকারি দল জাতীয় পার্টিকে ২৬টি আসনে ছাড় দিয়েছিল, সেখানে তারা পেয়েছে ১১টি আসন। কল্যাণ পার্টি ১টি ও বাকি ১টি সিটের স্থগিত নির্বাচন পরে অনুষ্ঠিত হবে।

ওপরের তথ্য থেকে পরিষ্কার যে দ্বাদশ জাতীয় সংসদের দলগুলোর সবাই সরকারি দলের অনুগ্রহ পাওয়া দল। বাদবাকি স্বতন্ত্র ৬২ প্রার্থীর প্রায় প্রত্যেকেই সরকারি দলের সদস্য, যদি না তাঁদের সদস্যপদ কোনো পর্যায় আওয়ামী লীগের গঠনতন্ত্রের ৪৭ ধারা অনুযায়ী বাতিল হয়। কথিত স্বতন্ত্রদের অনেকেই দলের বাইরে যেতে চাইবে না। কারণ, এতে তাঁদের ভবিষ্যৎ রাজনীতি ঝুঁকিতে পড়তে পারে।

এখন যে প্রশ্নটি সামনে এসেছে, তা হলো এবার 'গৃহপালিত' বিরোধী দল কারা হবে? সবকিছু মিলিয়ে মনে হয়, এবার অভিনব কিছু দেখা যেতে পারে। যদি জাতীয় পার্টি ১১ জন সদস্য নিয়ে বিরোধী দলের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়, তা হলে বাকি ৬২+১-এর ভূমিকা কী হবে?

এবারের নির্বাচনের আগেই বলেছিলাম যে শুধু ভোটার দিয়ে অন্তর্ভুক্তিমূলক নির্বাচনের সংজ্ঞা আন্তর্জাতিকভাবে গ্রহণযোগ্য হয় না। ভোট পড়ার হার নিয়েও যথেষ্ট বিতর্ক রয়েছে। ২৮ না ৪২ শতাংশ—এই বিতর্কের আনুষ্ঠানিক জন্ম দিয়েছে নির্বাচন কমিশন নিজেই। তবে দেশি-বিদেশি সংবাদমাধ্যম ও প্রত্যক্ষদর্শীরা এই নির্বাচনে এযাবৎকালের সবচেয়ে কম ভোটারের উপস্থিতির কথা বলেছে।

এ নির্বাচন বাংলাদেশের রাজনীতিতে অনেক প্রশ্ন রেখে যাবে। আওয়ামী লীগের মতো বড় ও প্রাচীন দলে এই নির্বাচনে অংশগ্রহণের পর যে বিভক্তি দেখা গেছে, দলের মধ্যে তার সুদূরপ্রসারী প্রভাব পড়বে। জাতীয় পার্টি, যাকে তৃতীয় বৃহত্তর পার্টি হিসেবে ধরা হতো, তার অস্তিত্ব প্রশ্নের মুখে পড়েছে। মনে হয়, দলটিতে বিভক্তি আসন্ন, যেমন সত্তরের দশকে জাসদের হয়েছিল। ভবিষ্যতে জাতীয় পার্টি ধর্তব্যের মধ্যে থাকবে বলে মনে হয় না।

অন্যদিকে প্রধান বিরোধী দল বিএনপি এবারও নির্বাচনে না আসার সিদ্ধান্তে অটল থেকেছে এবং তা সত্ত্বেও বড় ধরনের ভাঙনের মুখে পড়েনি। ইসলামী আন্দোলন এবারের নির্বাচন বর্জন করেছে। কিন্তু এই দলটি গত কয়েক বছরে যথেষ্ট রাজনৈতিক শক্তি সঞ্চয় করেছে এবং নিজেদের ভোটব্যাংক বাড়িয়েছে। এবারই প্রথম বাংলাদেশের প্রাচীন বাম দলগুলো এ নির্বাচনের বাইরে থেকেছে। এর সঙ্গে বেশ তরুণ নেতৃত্বে পরিচালিত কয়েকটি নতুন দল নিজেদের জায়গা করতে সক্ষম হয়েছে। তা ছাড়া কয়েকটি পুরোনো দল, যেমন এলডিপি ও জাসদের একাংশ নির্বাচনের বাইরে ছিল। কাজেই আগামী সময়ে সরকারবিরোধীরা বাংলাদেশের রাজনৈতিক অঙ্গন কতখানি সরগরম রাখবে, তা দেখার বিষয় হবে।

সবকিছু মিলিয়ে নতুন সরকারের সামনে অর্থনীতি সামাল দেওয়া, সুশাসন নিশ্চিত করা, দুর্নীতি দূর করা ও ভূরাজনৈতিক চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার পাশাপাশি জটিল রাজনৈতিক চ্যালেঞ্জও মোকাবিলা করতে হবে।

● **ড. এম সাখাওয়াত হোসেন** নির্বাচন বিশ্লেষক, সাবেক সামরিক কর্মকর্তা এবং এসআইপিজির সিনিয়র রিসার্চ ফেলো (এনএসইউ)
hhintlbd@yahoo.com